পরশুরামের কুঠার

BANGLADARSHAN.COM

সুবোধ ঘোষ

॥পরশুরামের কুঠার॥

চারিদিকের কোলিয়ারিগুলির সুদিন পড়েছে। বাজার বস্তি বাড়ছে। নিত্য নতুন কুলী করিগর কেরানী ও দোকানীর ভীড়ে নয়াবাদ যেন গেঁজে উঠেছে। নয়াবাদকে তাই আর শুধু বাজার বলা যায় না। শুধু একটা থানা দিয়ে আর সামলে রাখা সম্ভব নয়। একজন সাবডিভিসনাল অফিসারকে আদালত নিয়ে বসতে হলো নয়াবাদে। সেই থেকে নয়াবাদ মহকুমা।

কিছু ভদ্রলোকের আমদানী হলো। প্রথম যারা এলেন তাঁরা শুধু কয়েকজন উকীল, ডাক্তার আর একজন ওভার্সিয়ার। প্রাইমারী বাংলা স্কুল হলো একটা। মিউনিসিপ্যালিটিও চালু হলো।

তার অনেক আগেই নয়াবাদের লালমাটির ভাঙ্গা ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে ক্যাথলিক মিশনের সুন্দর একটা গীর্জা। দেশী খৃষ্টান মেয়েদের কনভেণ্ট, একটা অনাথালয় আর একটা জেনানা হাসপাতাল। ঝাউ বনের ফাঁকে সাদা নতুন ইমারতগুলি উঁকি দিয়ে ছবির মত স্থির হয়ে থাকে।

তারপর সুরু হলো নয়াবাদের একটানা অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন। রাতের রেলগাড়ীর মত নয়াবাদকে টেনে নিয়ে গেল বছরের পথ ধরে, হু হু করে, পরিণামান্তরে। কিন্তু সবচেয়ে বদলে গেল যে, নামধাম চেহারা পর্যন্ত–তার নাম ধনিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

বাঙালীটোলা থেকে সামান্য একটু দূরে দুর্গাবাড়ীর পেছনে এক আমড়াতলায় ধনিয়ার ছোট একটা মেটে ঘর। খাপরার ছাউনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘরের সুমুখে একটা ছাগল বাঁধা থাকে। বাঙলা স্কুলের ছেলেরা তাই নাম দিয়েছে, ছাগল লজ।

তিলকের মা ধনিয়া। তিলককে আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি। তিলকের বাবা কে, তাও কেউ জানে না। কিন্তু দু'তিন বছর পর পর নিয়মিতক্রমে তিলকের অনুজ ও অনুজারা ভূমিষ্ট হয়। শোণিতস্নাত এক একটি আনন্দের কণিকা যেন চুপে চুপে সকলের অলক্ষ্যে মায়ের হাত ধরে জীবনের পথে দেখা দেয়। তারপরেই হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে মেলার ভীড়ে হারিয়ে যায়। আর তাদের কেউ দেখতে পায় না।

থাকে থাকে, ধনিয়া একদিন উধাও হয়ে যায়। মাস দুয়েক তার আর দেখা পাওয়া যায় না। তখন তাকে পাওয়া যাবে মিশন জেনানা হাসপাতালের একটি ফ্রী বেডে। ক্ষুদ্র বিবর্ণ একটি মানুষের শাবক কুঁকড়ে পড়ে আছে ধনিয়ার বুকের কাছে। কটা দিন যেন উষ্ণ নরম ডানার তলায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। শ্লথ শরীরটা একটু ভরাট হয়ে আসে, চামড়ার ভাঁজ আর রেখাগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। মিটমিট করে তাকায়–হাত পা ছোঁড়ে। একটু স্পর্শ পেলেই চারাগাছের পাতার মত লোলুপ ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে।

তারপর আর নয়। পাখি উড়ে যায়। ধনিয়া একা ফিরে আসে তার ছাগল লজে। তিলকের ভাইটিও যথানিয়মে মিশন অনাথালয়ে চালান হয়।

ধনিয়া অদ্ভুত মানুষ। হাসপাতালের নার্সেরা আশ্চর্য না হয়ে পারে না। লেডি ডাক্তার হতবুদ্ধি হয়ে বলেন, "জীসস্। আমি সত্যি ঘাবড়ে গেছি। এই মেয়েটা আমার বাইবেল ও বিজ্ঞান উল্টে দিয়েছে। জানতাম পাখির বাচ্চাই বড় হয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম পাখিই পালিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে দিয়ে।"

ভদ্রলোকের পাড়া ঘেসে থাকে ধনিয়া। আত্মীয় বলে ওর কেউ নেই। ওর সমাজ নেই! কিন্তু এ শুধু সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত। সন্ধ্যের পর আর সে নিয়ম চলে না।

প্রতি রাত্রে সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে দেখা যায়, শুধু কানাকানির ওপর দিয়ে আমড়াতলায় এক অদ্ভুত পৃথিবীর লীলাখেলা চলেছে। আবছা আলো, চাপা হাসি। শব্দ এখানে শুধু ফিসফিস, গান এখানে শুধু গুঞ্জন। সবই অস্পষ্ট। এখানে কাউকে আসতে দেখা যায় না, কেউ কখনও চলেও যায় না। রাউণ্ডের পুলিশ ছাড়া সেসব অদৃশ্য ছায়া-জীবের পরিচয় আর কেউ জানে না। কিন্তু তা নিয়ে সোরগোল হয় না কখনও। রাত্রে যতবার ধনিয়া দরজা খোলে, রাউণ্ডের পুলিশেরও ততবার আয়ের পথ খুলে যায়।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ভদ্রসমাজে ধনিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা হয় কেন? ধনিয়ার কথা ভুলতে পারে না অনেকেই।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলা স্কুলের ছুটি হলে বাড়ী ফেরার পথে ছেলেদের মনে পড়ে ধনিয়াকে, ছাগল লজের আমড়া গাছ। ধনিয়ার ধমক খেয়েও দু'একটা পাকা আমড়া না চিবিয়ে আসলে ওদের সমস্ত জাগ্রত দিনের পরিতৃপ্তি যেন অপূর্ণ থাকে।

সন্ধ্যেয় ক্লাবঘরে উকীল ও ডাক্তারবাবুদের মধ্যে ধনিয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। তাঁরা বলেন—মেয়েটার কেউ নেই, অথচ চলে যায় বেশ। রহস্য বটে।

রাত্রি দশটার পর রাউণ্ডের কনষ্টেবলেরা পোষ্টে যাবার আগে এক টিপ খৈনি মুখে দিতেই ওদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সমস্ত রাত্রি টহলের একঘেয়েমি, তারই মাঝে আমড়াতলার সামনে মিষ্টি অন্ধকারে কিছুক্ষণ থমকে থাকা। ধনিয়ার ঘরের দরজার ফাঁকে প্রদীপের একটু ক্ষীণাভা—প্রাপ্তি ও পুরস্কারের দিব্যজ্যোতি। চাঁদনী রাতের আকাশের দিকে ওরা এত আগ্রহ করে মুখ তুলে কখনও তাকায় না।

এখানেই শেষ নয়। ধনিয়ার ব্যক্তিত্বের ছায়া আরও অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে, বাঙালী ভদ্রঘরের শুদ্ধান্তঃপুরে পর্যন্ত। এটা অবশ্য নিছক প্রয়োজনের তাড়নায়। ঘটনা এমনি দাঁড়ালো যে সন্তানবতী বধূসমাজও এহেন ধনিয়ার সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে আর পারলো না। তাদের মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাটুকু নইলে বুঝি মাঠে মায়া যায়।

ভদ্রবাড়ির প্রসূতিদের একটা না একটা আধি ব্যাধি লেগেই আছে। কেউ সূতিকায় জর্জর, কেউ রক্তহীনতায় সিটিয়ে যায়, কারও'র বা বুকের অপত্যনির্ঝর অকালে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মিশন হাসপাতালের লেডি ডাক্তার মোটা ফী নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসূতিদের পরীক্ষা করে অভিমত দিলেন। প্রসূতিদের চিকিৎসা চ'লতে পারে, কিন্তু শিশুদের জন্য কোন ট্রিটমেন্টই সফল হবে না। ওদের দরকার ভাইটালিটি, ওষুধ নয়।

"তবে উপায়?"

"–উপায় একজন সুস্থ সবল আয়া, শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ার জন্য।"

ঘরে ঘরে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এই বংশরক্ষার সঙ্কটে গরজের বালাই ডেকে আনল ধনিয়াকে। আমড়াতলা থেকে একেবারে ভদ্রবাড়ীর আঁতুড় ও অন্তঃপুরে।

ধনিয়ার ডাক পড়ে বাড়ী বাড়ী। বুকের দুধ খাইয়ে যাবার ঠিকে। দু'বেলার রেট মাসিক ছ'টাকা, দৈনিক একপো চালের সিধে আর ঠিকে শেষ হ'লে বিদায় নেবার দিন একটা নতুন শাড়ী। এই বরাদ্দে ধনিয়া বাড়ী বাড়ী খেটে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রত্যহ সকাল বা সন্ধ্যের আগে ধনিয়া ঠিক খাটতে বার হয়। হাতে একটা ভাঁজ করা পরিষ্কার তোয়াল। সব সময় মুখ হাসি হাসি। সুগন্ধ নেবু তেলে চুবিয়ে চুল বাঁধা। লাল সায়ার ওপর একটা পাতলা ধোলাই শাড়ী। চলবার সময় পায়ের আঙুলে রূপোর চুটকিগুলো খই ফোটার শব্দের মত বাজতে থাকে। নাকে একটা সোনার চিড়িতনের নাকছাবি–ঠোঁটের মিটিমিটি হাসির সঙ্গে মানিয়ে যায় বেশ। প্রসাধন তেমন কিছু নয়, পরিচ্ছন্নতাই বেশি। কিন্তু সুশ্রী চেহারা, হঠাৎ দেখে মনে হয়–বড় বেশি ঠাঁট।

ঘোষাল বাবুদের বাড়ির অন্দরে ধনিয়া ঢুকলো। এখানে একবেলা ঠিকে খাটতে হয়। মাত্র তিন মাসের একটা ছেলে।

ধনিয়াকে দেখেই ঝি প্রথমে মুখ কুঁচকে ঘরের ভেতরে চলে যায়। একটা মোড়ার ওপর বসে আছেন জীর্ণ শীর্ণ ঘোষালবাবুর স্ত্রী। সামনে একটা দোলনায় ঘুমন্ত নতুন খোকাটা।

ঝি গিয়ে জানালো–ঐ এসেছেন। কী ঠাট রে বাবা। গা ঘিন ঘিন করে।

ঘোষালবাবুর স্ত্রী বিদ্রোহিণী ঝিকে শান্ত করলেন।.....যাক্ মুখের ওপর কিছু বলিস নি ঝি। দায়ে পড়েছি কাজ নিতে হবে। ভেতরে যে যেমন লোক হোক্ না আমাদের কি?

ধনিয়া এগিয়ে এসে দোলনা থেকে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বসে। দু' একটা অবান্তর প্রশ্ন করে।—"আজ কেমন আছ দিদি?" উত্তরের কার্পণ্য দেখে আর বেশি কিছু বলে না। কাজ শেষ হবার পর একটুখানি দাঁড়ায়। গামছায় সিধে বেঁধে নিয়ে চলে যায়।

বিকেলে নরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের একটা জটলা বসে। হাজির হয় ধনিয়া। একটা ধাড়ি ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হয়। তিন বছর বয়সের রোগাপটকা ছেলে, পেটে এখনও গরুর দুধ হজম হয় না। বুড়োটে চেহারা আর উগ্র স্বভাব নিয়ে সারা বাড়ির লোককে জ্বালাতন করে। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কাঁদে আর মাটিতে গড়ায়। কোন প্রবোধ সান্ত্বনা মানে না।

বারান্দায় উঠে ধনিয়া হাততালি দিল।—আওয়া মেরা লাল।

চীৎকাররত ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত ভূতলশয্যা থেকে একবার ফণা তুলে তাকালো, তারপর এক দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধনিয়ার কোলে। খানিকক্ষণ ধনিয়ার হাতের বাজু নিয়ে টানাটানি উপদ্রব করলো। তারপর চুপ করে ধীর স্থির হয়ে গুটিয়ে শুয়ে পড়ল ধনিয়ার কোলে।

কিছুক্ষণ পরে ধনিয়া ডাকল—ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথায় শোয়াই?

অকস্মাৎ ঘরের ভেতর মেয়েদের মধ্যে যেন একটা বড় রকমের রসিকতার ঝড়ের দোলায় সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলো। জব্দ করার জন্য সকলে মিলে চেপে ধরলো নরেনবাবুর স্ত্রীকে।—কই, উত্তর দাও শীগগির। ছেলের নতুন মা তো কি বলছেন।

BANGLADARSHAN.COM

লজ্জায় ও বিরক্তিতে অপ্রস্তুত নরেনবাবুর স্ত্রী ছটফটিয়ে উঠলেন।—আমি ওর সঙ্গে কথা টথা বলতে পারবো না বাবা। পুঁটি, তুই গিয়ে খোকাকে নিয়ে আয়।

অগত্যা ওভারসিয়ার বাবুর মেয়ে পুঁটি, আট বছর বয়সের একটা বোকা বোকা খুকী, সেই এগিয়ে গেল।

ধনিয়া সিধের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণ সকলেই উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকে। এতখানি পথ হেঁটে এসেছে মেয়েটা, তবু পা দুটো পরিষ্কার। ধুলো ময়লা যেন পিছলে ঝরে গেছে।

কেউবা বেফাঁস বলে ফেলেন।—মাগির হাত দুটো কী নিটোল। আর তাগাটা যেন গায়ের মাংসের ওপর রূপো দিয়ে একেবারে আঁকা।

খিরকির দোর দিয়ে ধনিয়া অদৃশ্য হতেই পেছনের কৌতূহলী দৃষ্টিগুলি যেন শান্ত হলো। মাষ্টারের বউ নাকিয়ে নাকিয়ে দু'তিনবার শিউরে উঠলেন।—আমি আর লাল সায়া পরছি না বাবা। এ জন্মে নয়। আজ থেকে ইতি।

দুপুরে দেখা যেত ঘরের বাইরে একটা মোড়ার ওপর বসে ধনিয়া তামাক টানে। অদূরে ঘাসের ওপর চড়ন্ত ছাগলটার সঙ্গে স্নেহাপ্লুত স্বরে ডাকাডাকি, উত্তর প্রত্যুত্তরের পালা চলতে থাকে।

কিন্তু কদিন থেকে ধনিয়াকে আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমড়াতলার মেটে ঘরের দরজায় কুলুপ লাগানো। ধনিয়ার ছাগল বাঁধা রয়েছে নালার ধারে আর একটি কুঁড়ের সামনে, বুড়ো প্রসাদী ডোমের ঘর।

আশি বছরের মত বয়স হয়েছে প্রসাদীর। আঠার বছর বয়সে কালাপানি হয়েছিল একবার ডাকাতির দায়ে। তারপর ছাড়া পেয়ে আরও পাঁচবার জেল খেটেছে চুরির জন্য। মোট বিয়াল্লিশ বছর জেলের ভাত খেয়েই জীবন কেটেছে তার। বাইরে এসে রোজগার ক'রে ভাত খাবার রীতিনীতিই সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে একেবারে বসিয়ে দিল তাকে। ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে কোমরটা ভেঙে গেল, আর সোজা হলো না।

তার ওপর এল শরীর ছাপিয়ে বয়সের জরা। প্রসাদী শুধু টিকে রইলো মরবার জন্য। এখন ওকে দেখলে মনে হয় মূর্তিমান একটা ক্ষুধা হাঁ করে রয়েছে। ছাগলটা ছাড়া প্রসাদীই হল ধনিয়ার একমাত্র পোষ্য। দিনের রান্না শেষ করে ধনিয়া রোজ একথালা ভাত প্রসাদীর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে। এই জন্যই বোধহয় ওপর মরতে যা কিছু দেরী হচ্ছে।

প্রসাদীর ঘরের সামনে ধনিয়ার ছাগল। এদিকে জেনানা হাসপাতালে সন্ধ্যার আলো জ্বলছে। ধনিয়ার বেড ঘিরে নার্সদের ভীড়। সকলের মুখে একই অনুনয়।—অন্ততঃ এই বাচ্চাটাকে সঙ্গে রাখ ধনিয়া।

—না মিস্ বহিন, পারবো না।

BANGLADARSHAN.COM

লেডি ডাক্তার।—তোমার বদনামের কথা কে না জানে? চাপা দিতে তো আর পারবে না। তবে নিজের বাচ্চাকে নিজে রাখ না কেন?

—ডাক্তারনীজী, আমি খাওয়াতে পরাতে পারবো না। ছেলে কষ্ট পাবে আর বড় হয়ে আমার দুসমন হবে। ছেলেকে মানুষ করার মত পয়সা আমার নেই।

—কী বলছিস পাগলের মত। ভিখিরি মেয়েগুলোও ছেলে ছেড়ে দেয় না। ওদের বুঝি পয়সা খুব বেশী।

—ওরা ছেলেকে মানুষ করে না বহিন, ওরা ছেলেকে ভিখিরি করে। আমি তা পারবো না।

—আচ্ছা, আমরা সকলে কিছু কিছু চাঁদা দেব। ছেলে নিয়ে যা সঙ্গে।

—তা হলে আপনারাই কেউ ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে যান না। আমি না হয় আপনাদের আয়া হয়েই থাকবো।

লেডি ডাক্তার আর নার্সেরা বেশী বিতর্কে মন দেয় না। ধনিয়ার চোখের দিকে তাকাতে ওদেরও কেমন গা ছম্ ছম্ করে। সেবা মমতাকে তারাও ভাড়া খাটায়, কিন্তু ধনিয়ার এই প্রশান্ত নিস্পৃহা বড় নির্মম ও বিসদৃশ মনে হয়।

—আদাব। আমি চলি এবার।

ধনিয়া উঠে দাঁড়ায়। একজন নার্স ধনিয়ার বেবিকে বেড থেকে ফ্লানেলের টুকরোয় জড়িয়ে কোলে তুলে নেয়–নার্সারীতে চালান করা হবে। ধনিয়ার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই; কাঁসার থালা আর ঘটিটা একটা তোয়ালেতে বেঁধে, হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

আর একজন নার্স রেজিস্টার নিয়ে আসে। লেডি ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন–বাচ্চাকা বাপকা নাম?

ধনিয়া–তা জানি না।

লেডি ডাক্তার রেগে উঠলেন।–বারবার তোমার ঐ এক কথা। যার সঙ্গে আজকাল থাক, তারই নাম বলো না কেন?

–তোমার ভবিষ্যৎ খারাপ। খুব খারাপ।

লেডি ডাক্তার রাগ করে উঠে চলে যান।

মেলট্রেন নয়াবাদ ষ্টেশন ছেড়ে তখন সিটি বাজিয়ে জোর স্পীড নিচ্ছে। হাসপাতালের ইমারতটা কাঁপছে দুরদুর করে। লাল কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ধনিয়া নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে। কী রকম একটা দুর্বলতায় নার্সদের চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে আসে।

BANGLADARSHAN.COM

ফটক পার হতেই দারোয়ান ঘণ্টা দিল। রাত নটা।

বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। ধনিয়ার আমড়াতলার জীবনে কোন ছেদ পড়ে নি। বছর তিন আগে শুধু শেষবার জেনানা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

নয়াবাদ মিউনিসিপ্যালিটি জাঁকিয়ে উঠেছে। নতুন টাউন বাড়ানো হয়েছে প্লান করে। উকিলবাবু যে গাড়ি কিনলেন তারই নম্বর পড়লো সাতশো একচল্লিশ।

পাঁচ সাত দশ বার ষোল আঠারো–বছরের পর বছর ভেসে গেছে। ধনিয়া প্রায় চল্লিশের কোঠায় পা দিল। মাঝে মাঝে সড়কের ধারে খোলা উনুন জ্বেলে বসে–তেলেভাজা বেচে। সন্ধ্যের দিকে ঘরে ফেরার পথে কুলিরা কিছু কিছু কেনে। এক আধ ঝুড়ি ঘুঁটেও তৈরী করে কখনো, সব বিক্রী হয়ে যায়। চেহারায় হয়তো জলুসের অভাব, তার চেয়ে পয়সার অভাব বেশী। আমড়াতলায় ক্বচিৎ কোন রাত্রে লোকের গলার স্বর শোনা যায়। কিন্তু শরীর আছে, স্বাস্থ্য আছে। ধোনিয়া তাই ভয় পায় না। সে জানে তাকে ভিক্ষা করতে হবে না।

ভদ্রসমাজে ধনিয়ার আনাগোনা ঘুচে গেছে অনেকদিন। সন্তানবতীদের স্বাস্থ্য হয়েছে ভাল। বুকের দুধ খাওয়াবার ঠিকে নেই। তা ছাড়া সাগর পার থেকে ধনিয়ার বহু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে–হরেক রকমের বিলিতি ফুড। এঁড়ে লাগা নবজাতকদের ধুকপুকে আয়ু ভিজিয়ে রাখতে ধনিয়ার আর ডাক পড়ে না। তাকে বোধ হয় সকলে ভুলেই গেছে।

বড়দিনের ছুটি। পাটনার স্কুলকলেজগুলি বন্ধ। ছেলেরা ঘরে ফিরেছে। শিকার পিকনিক কার্ণিভাল আর প্রদর্শনীর মরসুম। নয়াবাদের ধমনী বিচিত্র উৎসাহে চঞ্চল। সেদিন ধনিয়ার ঘরে উনুনে আগুন পড়লো না। একটিও পয়সা নেই হাতে। অনেকদিন আগের ঘটনাগুলি, নানা রঙে রঙীন একটা মায়াময় আলেখ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

ধনিয়া উঠলো।—বাবুদের বাড়ী বাড়ী একবার দেখা করে আসি। একদিন তো চাকরি করেছি। পরবীর দাবী করা যেতে পারে। যদি খুসী মনে দেয়—দশ টাকাও যদি ওঠে।

নরেনবাবুর বাড়ীর অন্দরে ঢুকতে পেল না ধনিয়া। ঘোষালবাবু চার আনা দিলেন। ধনিয়া দেখলো—বাড়ীময় ছেলেপিলে। ছেলেগুলো বেশ ঢ্যাঙা হয়ে গিয়েছে।

আর একটা বাড়ী। এতটা নিষেধের কঠোরতা এখানে নেই। কিছু সিদে দিয়ে গিন্নিমা বললেন—যা পাবার পেলে বাছা, এবার ওঠ শীগগির।

ধীরেনবাবুর বাড়ির দেউড়িতে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ঝি এসে একটা টাকা হাতে দিল।—মা দিয়েছেন, এই নিয়ে বিদায় হও।

ধনিয়া বলে—এ ঝি দিদি, তোমাদের বড় ছেলে কই?

BANGLADARSHAN.COM

ঝি কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল—ঐ যে তাস খেলছে। তা, এত খোঁজে দরকার কি তোমার?

—উঃ কত বড় হয়ে গেছে। দাঁত ওঠার পরও মাই ছাড়াতে পারি নি। একবার কামড়ে দিয়ে কী নাকাল করেছিল, মনে আছে তো ঝি?

—আদিখ্যেতা ভালো লাগে না বাপু। তুমি যাও। এদিকে ঘেঁসতে আর এস না।

আরও অনেক বাড়ী বাকি আছে। কিন্তু একটা ঘটনা ধনিয়াকে ভাবিয়ে তুললো। এটা তো ঠিক পরবী পাওয়া যাচ্ছে না। একেই বোধ হয় ভিক্ষে বলে।

ভিক্ষে? সন্ধ্যে হতে দেরী আছে। ধনিয়া তবু জোরে পা চালিয়ে ঘরের দিকে ফিরে গেল।

কিন্তু জের সহজে মিটলো না। ঘরে ঘরে ঝি আর গিন্নিদের আপত্তির কলরব শোনা গেল।—ও রাহু, আবার এতদিন পরে উদয় হলো কোথা থেকে? পাড়াভরা সব আইবুড়ো ছেলে। মাগী যে কখন কার সর্বনাশ করে বসে কে জানে।

কর্তারা শুনলেন। একেবারে বাজে আশঙ্কা নয়। পাড়া ঘেঁসে এসব জীব থাকা উচিত নয়। ওরা থাকলেই যত গুণ্ডা বদমাসের উপদ্রব টেনে আনে।

ক্লাবের সান্ধ্যবৈঠকেও বিষয়টা আলোচিত হলো। প্রস্তাবটা সকলেই অনুমোদন করলেন। দুর্গাবাড়ীর কাছাকাছিই আমড়াতলার ও নোংরামি এবার সরিয়ে দেওয়াই উচিত।

ব্যাণ্ডের শব্দ। ধনিয়া হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখে দাঁড়ালো। মিশন অনাথালয়ের ছেলেরা মার্চ করে বনভোজনের উৎসবে যোগ দিতে চলেছে। নীল ব্লেজারের হাফ প্যান্ট আর সাদা ফ্লানেলের সার্ট। পায়ে লাল মোজা আর বুট। পাঁচ থেকে ষোল বছর বয়স, অন্যপুষ্ট কিশোর মানুষের একটা পল্টন। শোভাযাত্রার আগে আগে ওদেরই ব্যাণ্ড পার্টি। এদের পোষাক একটু ভিন্ন ধরনের। মাথায় ভেলভেটের টুপি, তাতে সাদা পাখির পালক আর কচি ঝাউপাতা পিন দিয়ে আঁটা। নধর অধরে ছোট ছোট ব্যাগপাইপের রীড। ছোট ছোট ড্রাম ষ্ট্রাপ দিয়ে বুকের ওপর ঝোলানো।

বড়দিনের প্রভাত সূর্য্যের আভা সবে মাত্র কুয়াসা ঠেলে পথে লুটিয়ে পড়েছে। শোভাযাত্রা এসে মোড়ের কাছে একবার থামলো। ব্যাগপাইপ আর ড্রামগুলি তিনবার শব্দের ঝনৎকার তুলে স্তব্ধ হলো। আশ পাশ থেকে পিল পিল করে ছেলে মেয়ে বুড়ো–কৌতূহলী একটা জনতা এসে ওদের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

ধবধবে সাদা আলখাল্লা আর প্যান্টালুন পরা এক পাদরী সাহেব ডেভিডের একটা গাথা হিন্দীতে সুর করে পড়লেন।

–আমেন!

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেদের গলার স্বর। বনান্ত বাতাসের শব্দ; ঝর্নার শব্দ–ভোরবেলার পাখির গলায় কাকলির মত শব্দ। ধনিয়ার যেন একটু চমক লাগলো। এগিয়ে গিয়ে শোভাযাত্রার কাছাকাছি দাঁড়ালো, একটা গাছে ঠেস দিয়ে।

লম্বা দাড়িওয়ালা পাদরীগুলোকে দেখতে কেমন একটু ভয় ভয় করে। একজন পাদরী বক্তৃতা করলেন, বুকের ওপর ক্রশটা চিক্ চিক্ করছে।–আজ থেকে উনিশশো চল্লিশ বছর আগে বেটেলহামের আকাশে এমনি এক সকাল বেলায় লাল সূর্য উঠেছিল। এক দরিদ্র ছুতোর নারীর কোলে মানবপুত্র আবির্ভূত হলেন।

পাদরীর বক্তৃতার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। ধনিয়া একটু সরে দাঁড়ালো, যাতে ছেলেদের মুখগুলি স্পষ্ট দেখা যায়।

–সেই মানবপুত্র একদিন কাঁটার মুকুট পরে চলেছেন জেরুসালেমের পথে নিজেকে বলিদানের জন্য, তোমার আমার পরিত্রাণের জন্য...।

ধনিয়ার চোখের দৃষ্টি তখন অদৃশ্য চুম্বনের মত প্রত্যেকটি ছেলের মুখের ওপর ছোঁ মেরে ফিরছে। এর মধ্যে অন্ততঃ ছ'টি তারই উপহার। কিন্তু কে তারা চেনবার উপায় নেই। ঐ ড্রাম বাজিয়ে দশ বছর বয়সের ছেলেটি সার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে। হয়তো সেই একজন। কিম্বা পাশেরটিও হতে পারে। কিন্তু কে নয়? মনে হচ্ছে সবাই।

কিসের ভাবে যেন দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। জনতা কখন সরে গেছে। দূর বনের মাথায় কুয়াসা গেছে গলে। মাঠের মাঝ দিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। ধূলো উড়ছে। সকল পার্থিবং রজঃ মধুময় হয়ে উঠেছে।

গাছের ঠেস ছেড়ে দিয়ে অতি অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে ধনিয়া ঘরের দিকে ফিরলো। অগাধ এক ক্লান্তি ও পুলকের বন্যা যেন সমস্ত শরীর ছাপিয়ে বয়ে চলে গেছে—প্রিয়সঙ্গ সুখের চরম ক্ষণে উৎসারিত সজলাসারের মত। বুকের ওপর আঁচলটা ভাল করে টেনে নামিয়ে দিল ধনিয়া। কাঁচুলি ভিজে গেছে।

মিউনিসিপাল কমিশনারের বৈঠক। কোতোয়ালী অফিসারের কাছে জরুরী নোট পাঠানো হলো।—শহরের নানা ভদ্রপল্লীতে কতগুলি নষ্টচরিত্র ছোট জাতের মেয়ে প্রচ্ছন্নভাবে কুৎসিত ব্যবসায়ে লিপ্ত রয়েছে। তাদের যেন সেগ্রিগেট করে বাজারের লাইনে বসিয়ে দেওয়া হয়।

কড়া সরকারী নির্দেশ। টাউন থানার পুলিশের ওপর ভার পড়লো। এই ধরনের দুষ্টা মেয়েদের নামের লিষ্টি দাখিল করতে—খাতায় নাম চড়িয়ে সকলকে বাজারের লাইনে বসিয়ে দিতে।

ধনিয়ার আমড়াতলার সংসারেও এ নির্দ্দেশের আঘাত এসে পৌঁছতে দেরী হলো না। আর এভাবে চলবে না। হয় সরে পড়, নয় পথে এস—কিম্বা সুপথে থাক।

ধনিয়া সাধ্যসাধনার ত্রুটি করলো না। ঘটিবাটি বেচে টাউন পুলিশকে নগদ ত্রিশ টাকা পান খাবার খরচ দিতে রাজী হলো। তাকে রেহাই দেওয়া হোক। কনষ্টেবলেরা মানলো না কেউ—এবার আর ফাঁকি নেই। আমাদেরও চাকরির ভয় আছে। নাম তোমাকে লেখাতেই হবে।

BANGLADARSHAN.COM

হেড কনষ্টেবল ধমক দিলো,—ওসব ফন্দি ফিকির ছাড় এবার। নাও, টিপ সই দাও।

রাত্রি হয়েছে। প্রসাদী দোসাদ হাঁটুতে মুখ গুঁজে আগুনের ধুনীর সামনে বসেছিল। ধুনীর আগুন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কানের কাছে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা। প্রসাদী কানে শুনতে পাচ্ছে না কিছু। বাঁ পায়ের কাছে আঙুলটা একটা জ্বলন্ত অঙ্গার লেগে ঝলসে গেছে। তবু কোন জ্বালা নেই। সকাল থেকে শরীরটা শুধু সির্ সির্ করে কেঁপেছে। এখন সে স্পন্দনও নেই। আজ দুদিন ধরে ধনিয়া আসছে না। পেটে এক দানাও ভাত পড়েনি।

—প্রসাদী চাচা। ধনিয়া এসে ফুঁপিয়ে কেঁদে পড়লো। প্রসাদী তবু সাড়া দিল না। ধনিয়া বুড়োকে একবার জোরে ঝাকানি দিয়ে থুতনিটা টেনে ওঠালো। বুড়ো চোখ মেলে তাকাতেই আবার ডাকলো।—প্রসাদী চাচা।

ধনিয়া কাঁদছে। এ কান্নার বেদনা বিদ্যুতের ছোঁয়াচের মত প্রসাদীকে যেন আঘাত করলো। ধড়ফড়িয়ে উঠলো শরীরটা।—এ কি? তুই ধনিয়া?

—হাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী।

—ছি ছি, এ কি বলছিস?

–হা চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।

–আরে না, তুই তো লছ্মী।

–না চাচা, আমার স্বামী নেই।

–গাইগরুরও স্বামী নেই, তারা কি লছ্মী নয়?

–তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই। আমি মানুষ।

ধনিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো–এবার চলি চাচা, আর দেখা হবে কিনা জানি না।

অপগণ্ড ছেলের মত প্রসাদী একবার তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো, ধনিয়ার হাতে সেই পরিচিত গামছাবাঁধা ভাতের থালাটা নেই, তার নিত্যদিনের প্রাণের পসরা। প্রসাদী হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাক্স্ফূর্তি হলো না। মূক অভিযানে যেন হাঁটুর ভেতর আবার মাথাটা গুঁজে দিল। আর একবার নতুন করে কানের কাছে বেজে উঠলো কূলহারা কালাপানির উতরোল।

দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। আনমনে মাথার কাপড়টা ফেলে দিয়ে এলো-চুল গুছিয়ে শক্ত করে একটা খোঁপা এঁটে দিল। আঁচল দিয়া তেলা মুখটা মুছে নিল একবার। তারপর সেই চিরকেলে মিটিমিটি হাসি আবার সারা মুখে চিক চিক করে উঠলো।

BANGLADARSHAN.COM

–তুমি রাগ করেছ চাচা! ধনিয়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অসহায় অসাড় প্রসাদীর জরাজর্জর শরীরটাকে বেড়ালের ছানার মত কোলের ওপর তুলে নিল! কাঁচুলি খসিয়ে প্রসাদীর মাথাটা চেপে ধরলো বুকের কাছে। আঙুল দিয়ে বুড়োর মাথার পাকা চুলের জটগুলি ছাড়িয়ে দিতে লাগলো আস্তে আস্তে।

একটি ঘণ্টা পর। পরিতৃপ্তির আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রসাদী। ক্লান্ত সিক্ত চোয়াল দুটো এলিয়ে পড়েছে। প্রসাদীকে ধুনির কাছে মাটিতে শুইয়ে দিল ধনিয়া।

চকবাজারের দক্ষিণে একটা চওড়া গলি, দুদিকে দোতলা বাড়ির সারি। গলির ঠিক মাঝামাঝি পথের দুদিকে মুখোমুখি একটা দেশী আর একটা বিলাতী মদের দোকান। নীচের তলার সব ঘরগুলিই দোকান–পানবিড়ি, সরবত, আতর, চাট আর চামেলী তেল। একটা দোকানে ভাঙা তবলা পাখোয়াজ মেরামত হয়। পথের মাঝে একটা গাছতলায় শানবাঁধানো চাতালের ওপর হিজ্রেরা হাততালি দিয়ে নাচে। ওপরতলার জানালাগুলি সন্ধ্যের পর থেকেই এক এক টুকরো বায়স্কোপের পর্দার মত আলোয় ঝলমল করে। রূপের বেসাতিনীদের লাইন।

নতুন বছরের দোতলার লাইনে একটা নতুন ঘরের জানালা খুলে গেল।

চল্লিশ বছরের আগুনে শুদ্ধ করা জীবন যৌবন, তার সব খাদ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ধনিয়া মনের মতো করে সাজলো।

ঘরের ভেতর ঝাড়ের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে, চুড়ো করে খোঁপা বাঁধলো। একটা সোনালী চুম্‌কিদার রুমাল জড়িয়ে দিল তার ওপর। ঝুটা মতির মালা দিল গলায়। একটা পাতলা নীল রেশমী শাড়ীকে সায়া ছাড়াই কোমরে জড়িয়ে নিল, মুঠো মুঠো পাউডার ছিটিয়ে দিল গায়ে। কড়া জরদা দিয়ে একগাল পান চিবিয়ে ঠোঁট মুখ রক্তাক্ত করে নিল। এক পেয়ালা নির্জলা দেশী মদ ঢক ঢক করে খেয়ে গরম করে নিল গলাটা। সবুজ মখমলের কাঁচুলি বাঁধলো আঁটসাট করে। হাফগরাদ জানালার ওপর কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো ধনিয়া।

ময়রার দোকান থেকে ধোঁয়া আর ভাজা পাঁপড়ের গন্ধে শীত-রাত্রির বাতাস ভারি হয়ে গেছে। নীচের সড়কে গ্যাসপোষ্টের কাছে ক্ষুদ্র একটা জনতা, হাঁ করে জানালার দিকে তাকিয়ে।

হোক রাত্রি, হোক নেশা আর গ্যাসলাইটের পোড়া জ্যোৎস্না। ওদের ঠিক চিনতে পারা যায়। লক্কা চেহারা ঘোষালবাবুর বড় ছেলেটা ঘনঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। চোখে চোরা চাউনি খাজাঞ্চীবাবুর ছেলেটা রুমাল নেড়ে কিছু একটা ইসারা করার চেষ্টা করছে। টলতে টলতে একটা মাতালও এসে দাঁড়ালো ওদের মধ্যে। হাতের মুঠো দুটো একটা চোখের ওপর দূরবীণের মত লাগিয়ে কিছুক্ষণ তাক্ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মাতালটা।

এক ঢোক পানের পিক গিলে নিল ধনিয়া। কানদুটো তেতে ঘেমে উঠেছে। আঁচলটা গা থেকে পেছনে ঠেলে নামিয়ে দিল। দুহাত তুলে মাথার ওপর জানালার খিলানটা ধরে বুকটা সামনের গরাদের ফাঁকে জোরে চেপে ধরলো ধনিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

জনতার চোখের ধাঁ ধাঁ। অসম্বৃতা এক রঙীন মরীচিকার মূর্তি জ্বলছে জানালার ওপর। নীচের পাতলা রেশমী শাড়ীর আড়ালে আঁকা দুটি অস্পষ্ট জঙ্ঘার ছায়াময় লোভানি। ওপরে একজোড়া দুরন্ত সবুজ গ্রহ, কাঁচুলির বন্ধনে চিরকালের মত গতিহারা।

সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে বিদঘুটে আনন্দের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো ধনিয়া। তবু প্রতীক্ষায় শান্ত হয়ে থাকে। সে আজ দাঁড়িয়ে থাকবে মাঝরাত্রি পর্যন্ত, শেষরাত্রি পর্যন্ত—যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু দোরে এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।

॥সমাপ্ত॥